PRANTIK GABESHANA PATRIKA
MULTIDISCIPLINARY-MULTILINGUAL-PEER REVIEWED-BI-ANNUAL
DIGITAL RESEARCH JOURNAL
WEBSITE: SANTINIKETANSAHITYAPATH.ORG
VOLUME-1 ISSUE-2 JANUARY 2023

বাৎসল্য রসের কবি ভাস্কর চক্রবর্তী

রাহুল ঘোষ

LINK: https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2023/01/10_বাৎসল্যরসের-কবি-ভাস্কর-চক্রবর্তী.pdf

সারসংক্ষেপ: ভাস্কর চক্রবর্তীর (১৯৪৫-২০০৫) প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা' প্রকাশিত হয় ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অধুনা প্রকাশন থেকে। এই কাব্যগ্রন্থের চল্লিশটি কবিতা লিখিত হয়েছিল ডিসেম্বর ১৯৬৫ থেকে অগস্ট ১৯৭১এর মধ্যে। তাঁর কবিতায় বাৎসল্য রসের ব্যবহারিক প্রয়োগ শুরু হয়েছে উক্ত কাব্যগ্রন্থে। এই কাব্যগ্রন্থের "ছোটো বোন" কবিতায় আমরা পেয়েছি কবির স্নেহ ও ভালবাসার এক মধুর দরদী প্রস্রবণ। কবিতাটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতায় বারবার ফিরে ফিরে এসেছে এই ছোট বোন প্রসঙ্গ। 'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা'র পরবর্তী বিভিন্ন কাব্যে বোনেদের কথা, মায়ের কথা, বাবার কথা বর্তমান।

সূচক শব্দ: নকশাল আন্দোলন, বাৎসল্যরতি, বৈষ্ণবসাহিত্য, শাক্তসাহিত্য, ছোট বোন, জার্মান অনুবাদ, সোনাঝুরি, জিরাফের ভাষা।

১

আমি দেখতে পাই, আমার শিশু জন্মাচ্ছে —

ও.টি-র সামনে মাথা নিচু করে আমি বসে আছি।

মরুপ্রদীপ ১, ভাস্কর চক্রবর্তী

১৯৬৫-১৯৮৯ এই সময়পর্বে ভাস্কর চক্রবর্তীর পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। যথা 'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা', 'এসো সুসংবাদ এসো', 'রাস্তায় আবার', 'দেবতার সঙ্গে', 'আকাশ অংশত মেঘলা থাকবে'। এছাড়াও 'স্বপ্ন দেখার মহড়া' এবং 'নীল রঙের গ্রহ' কাব্যগ্রন্থের কিছু কবিতা এই সময় রচিত হয়েছিল। আমরা ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতা পড়লে লক্ষ্য করব একই সময়ে লেখা কবিতা ভিন্ন ভিন্ন কাব্যে স্থান পেয়েছে। কবি কাব্যগ্রন্থের কবিতা নির্বাচনের ব্যাপারে খুবই বিচক্ষণ ছিলেন।

১৯৭১এ পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিবেশ বেশ উত্তাল। এই কালে সংগঠিত হয়েছিল নকশাল আন্দোলন। পাশাপাশি চলছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। এই রাজনৈতিক পটভূমিতেই প্রকাশিত হয় ভাস্কর চক্রবর্তীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। 'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা' প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান', 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী', শঙ্খ

ঘোষের 'নিহিত পাতালছায়া', আলোক সরকারের 'বিশুদ্ধ অরণ্য', অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের 'নিষিদ্ধ কোজাগরী', 'রক্তাক্ত ঝরোখা', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আমি কীরকম ভাবে বেঁচে আছি', অরুণ মিত্রের 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে', নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'উলঙ্গ রাজা', বুদ্ধদেব বসুর 'স্বাগত বিদায়' কাব্যগ্রন্থ।

ভাস্কর চক্রবর্তী প্রথম কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করেছিলেন বন্ধু বুদ্ধদেব দাশগুপ্তকে। এই কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'দিগভ্রান্তি' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে কৃত্তিবাস পত্রিকার ২২ নম্বর সংখ্যায়। শীতকাল কবির প্রিয় ঋতু। অন্য কবিদের মতো তিনি বসন্ত বা বর্ষায় গা-ভাসাননি। শীতের রাত্রিতে কবির পছন্দ এক অসম্ভব ফাঁকা মাঠে এসে দাঁড়িয়ে পড়া। এই কাব্যগ্রন্থে প্রথম থেকেই আমরা এক বিষাদে আচ্ছন্ন হতে দেখি কবিকে। কবির কথায় — "শোক এলেই মা-র কথা মনে পড়ে।" কবি চেয়েছেন শীতের রাতের মতো শীতল ভালবাসা ছড়িয়ে দিতে কিন্তু তাতে বারে বারে এসেছে ব্যর্থতা। সেই ব্যর্থতা তাঁকে শীতঘুমের দিকে টেনে নিয়ে গেছে।

কবির বেদনার সঙ্গী আরো তিনজন বন্ধু। তাদের "স্বর্গ নেই স্যারিডন আছে"। এই ক্রোধ ভাবরূপে ছিঁটকে পড়েছে পরের কবিতাগুলিতে। কবির তিনমাস ঘুমিয়ে থাকা আসলে ঘুমিয়ে থাকা নয় — বীভৎসতার মধ্যেও ধৈর্যপূর্ণ আত্ম-অন্বেষণ। পাতা ঝরার মরশুমে একজন বাইশ বছরের যুবকের চৈতন্যের গভীরে পৌঁছে যাওয়ার প্রবল আকুতি। 'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা' কবিতায় তাই তো পাই চুলপোড়ার গন্ধে ঘুমিয়ে পড়ার পরেও রাস্তায় হাঁটার কথা। 'মোষ', 'অসুখ' এই কবিতাগুলিও সেই সামাজিক বিদ্রোহের পথে হাঁটে।

'এসো সুসংবাদ এসো' কাব্যগ্রন্থের আলাপ অংশ শুরু হয়েছে এভাবে — "তাহলে শুরু করছি স্রেফ নমস্তে জানিয়ে। আবার যে আপনাদের কাছে আমি ফিরে আসতে পারবো কোনোদিন — বজায় থাকবে সেই পুরোনো হাসি — ভাবতেই পারিনি কখনো।" দীর্ঘ দশ বছর পর আবার কবির কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ শ্লেষপূর্ণ ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে ওপরের অংশটুকুতে। এই কাব্যগ্রন্থ তিনটি মূল পর্বে বিভক্ত — দিনরাত্রির আলোয়, এসো সুসংবাদ এসো, মানুষের দেশে। 'দিনরাত্রির আলোয়' পর্বের সমস্ত কবিতা গদ্যফর্মে লিখিত। এই স্টাইল ভাস্কর চক্রবর্তীর সব থেকে পছন্দের। 'এসো সুসংবাদ এসো' পর্বের কবিতায় শব্দ, নীরবতা, ছন্দ ও স্পেস খুব গুরুত্বপূর্ণ। কবিতাগুলি বেশির ভাগই অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। 'মানুষের দেশে' পর্বের কবিতাগুলি পঙক্তিবিন্যাসের দিক থেকে দেখতে গেলে ছন্দোবদ্ধ মনে হলেও আসলে সেগুলি গদ্যকবিতা। Emergency (1975, June), অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, বিষণ্ণতা, চাপা আয়রনি, প্রতিবাদ এই কাব্য গ্রন্থকে ছুঁয়ে আছে।

'রাস্তায় আবার' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি অত্যন্ত সংকট সময়ে লেখা কবিতা। কবির লেখা ১৯৮২, ১৯৮৩ সালের ডায়েরি পড়লেই তা বোঝা যায়। দারিদ্র্য, হতাশা, ক্লান্তি, একাকিত্ব, নিঃসঙ্গতা, ভালবাসার মানুষের সঙ্গে ক্ষণস্থায়ী বিচ্ছেদ কবিকে পথচারী করে তুলেছিল। Malnutrition, Social aggression, Self-aggressionএর কথা এই বইতে আছে। হতাশা থেকে মুক্তির বড় মাধ্যম কবির এসময় রবীন্দ্রসংগীত। এসময় প্রচুর রবীন্দ্রসংগীত শুনছেন কবি। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর আকর্ষণ প্রবল হচ্ছে। ১৯৮২এর ডায়েরিতে আমরা ১৯৪টা রবীন্দ্রসংগীতের তথ্য পাচ্ছি। এসময়ই রচিত হচ্ছে 'দেবতার সঙ্গে' কাব্যগ্রন্থের পঁচিশটি নামহীন গদ্যকবিতা।

"দেবতার সঙ্গে আজ হঠাৎ বিকেলবেলা মিনিবাসে শহরে গেলাম।" এই দেবতা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। নিঃসঙ্গ কবি অনুভব করছেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গ। কবি ফিরে আসছেন আত্মহত্যার পঙ্কিল পথ থেকে। এর ফলস্বরূপ আমরা পাচ্ছি কবির এই অনুভব — "আমি সুখী, আমার কবিতায় এসেছে এমন এক জীবনবোধ, যা অপরকে বেঁচে থাকতে অনুরোধ করে।" ১৯৮৫-৮৬ সালে খসড়া কবিতার খাতায় কথাটা লিখে রেখেছিলেন ভাস্কর চক্রবর্তী। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর ১৯৮৯এ প্রকাশিত হয় 'আকাশ অংশত মেঘলা থাকবে' কাব্যগ্রন্থ। বরানগরের গণহত্যার (অগস্ট ১৯৭১) স্মৃতিযুক্ত কিছু কবিতা, মৃত্যুচিন্তা বিষয়ক কিছু কবিতা, এলিজি-মূলক কিছু কবিতা আমরা এই কাব্যগ্রন্থে পেয়ে থাকি।

শীত, বিষাদ, গার্হস্থ্যজীবন, মৃত্যু ও জীবন চেতনা, অপুষ্টি, প্রেম, মানুষের প্রতি বিশ্বাস ও বিচ্যুতি বারেবারে ফিরে এসেছে কবির প্রথম পর্যায়ের কবিতায়। ভাস্কর চক্রবর্তী তাঁর কবিতায় নিপুণভাবে চিত্রকল্প ও প্রতীকের প্রয়োগ করেছেন। উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, সমাসোক্তি প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রয়োগ তাঁর কবিতায় আমরা লক্ষ্য করি। বকুলফুলের মতো সিগারেটের টুকরো, ডানাহীন চৈত্রের দুপুর এসব পঙক্তি ওপরের কথার সাক্ষ্য বহন করে।

২

'স্বপ্ন দেখার মহড়া', 'তুমি আমার ঘুম', 'নীল রঙের গ্রহ', 'কী রকম আছো মানুষেরা' এবং 'জিরাফের ভাষা' প্রকাশিত হয় ১৯৯০-২০০৫ — এই সময় পর্বের মধ্যে। আমরা আগেই বলেছি 'স্বপ্ন দেখার মহড়া' ও 'নীল রঙের গ্রহ' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি দীর্ঘদিন ধরে লেখা হয়েছে। 'স্বপ্ন দেখার মহড়া' কাব্যগ্রন্থের রচনাকাল ১৯৮৬-৯২, 'নীল রঙের গ্রহ'র রচনাকাল ১৯৬৬-৯৮, এবং 'তুমি আমার ঘুম' কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতা ১৯৮৫-৮৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে লিখিত।

'স্বপ্ন দেখার মহড়া' কাব্যগ্রন্থ থেকে 'জিরাফের ভাষা' কাব্যগ্রন্থের যাত্রাপথ 'আকাশ অংশত মেঘলা থাকবে' পরবর্তী পর্যায়; ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিজীবনের দ্বিতীয় পর্যায় বলে চিহ্নিত করে আলোচনা করতে চাইছি। দেশ পত্রিকার ২৮ অগস্ট ১৯৯৩ সংখ্যায় এই কাব্যগ্রন্থকে বিজ্ঞাপনে "বিপন্ন সময়ের কাব্যগ্রন্থ" বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। আমরা কেন কবির এই কাব্যকে মান্য মনে করে বিভাজনে অগ্রসর হচ্ছি তা একটু উল্লেখ করা যাক।

১৯৮৫ সালের ভাস্কর চক্রবর্তীর ডায়েরিতে এই ক'টি কথা আমরা পেয়েছি — "ফাঁকি দিচ্ছি, সময়ে। জেগে থাকার প্রতিটি মুহূর্তে সচেতন আর মনস্ক আর অভ্যর্থনাময় হতে হবে আবার কবিতার জন্যে। পরিশ্রম করতে হবে আবার, আরো।" কবির মনে হচ্ছে কবিতা লেখায় কোথাও যেন একটু ফাঁক থেকে যাচ্ছে। তাই তিনি কবিতার পিছনে আরো সময় দিতে চাইছেন; আরো পরিশ্রম করতে চাইছেন। 'আকাশ অংশত মেঘলা থাকবে' কাব্যগ্রন্থের 'স্মৃতি' কবিতা প্রসঙ্গে কবির দিনলিপিতেও কয়েকটি কথা লেখা আছে — " 'কবিতা এত ছোট হচ্ছে কেন? ফাঁকি।' — সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আজ যখন জানালেন; 'হয়তো বোবা হয়ে যাচ্ছি', হেসে এছাড়া আর কীই বা বলতে পারতাম আমি?" স্পষ্টতই বোঝা যায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় চেয়েছিলেন ভাস্কর চক্রবর্তী কবিতার ফর্মের দিকে আরেকটু বেশি গুরুত্ব দিন। সেই চেষ্টারই মহড়া দেখতে পাব আমরা এই কাব্যগ্রন্থে। আরেকটি প্রসঙ্গ উল্লেখ না করলেই নয়। ভাস্কর চক্রবর্তী রক্তমাংস পত্রিকার ১৯৯৯ বইমেলা সংখ্যায় অদ্রীশ বিশ্বাসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এই কাব্য প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন — "একসময় আমি ভীষণ দুঃস্বপ্ন দেখতাম। ভয় আর ভয়ের স্বপ্ন। ঘুমোতে যাওয়াটাই যেন দুশ্চিন্তার হয়ে উঠল। এর থেকে মুক্তি পাওয়ার চিন্তা শুরু করলাম। এই চিন্তায় সাহায্য করল শ্রীঅরবিন্দর বই... আমি তারপর আর ভয়ের স্বপ্ন দেখি না।" শ্রীঅরবিন্দর গ্রন্থ কবিকে সাহায্য করেছিল দুঃস্বপ্নকে ভাল স্বপ্নে রূপান্তরে। জীবনের পথেও এরপর আমরা দেখব ভাস্কর চক্রবর্তী নঞর্থক চিন্তা কমিয়ে সদর্থক চিন্তার দিকে বেশি করে ঝুঁকছেন। কবিতায় এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। এই কাব্যগ্রন্থে কবি কোনোরকম বিরতিচিহ্ন ছাড়াই একপ্রকার প্রবহমান গদ্যস্পন্দে কবিতাগুলি লিখেছেন। কবি এই কাব্যে অনেক বেশি নাগরিক। কলকাতাকেন্দ্রিক নানা স্মৃতি, অভিজ্ঞতা এই সময়ের কবিতায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ফুটে উঠেছে। এইসব কবিতায় আছে বর্ণনার প্রাধান্য।

'তুমি আমার ঘুম' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি লেখার সময়েই প্রস্তুত হচ্ছিল কবির অন্যতম গদ্যগ্রন্থ 'শয়নযান' এবং ছোটদের বিবেকানন্দের জীবনী 'বিবেকানন্দ'। করছিলেন কন্নড় কবিতার অনুবাদ। এই কাব্যগ্রন্থে বুদ্ধপ্রসঙ্গ, কন্যাকে নিয়ে লেখা বাৎসল্যরসের কবিতা, দিদিকে নিয়ে লেখা কবিতা, শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে স্মরণ করে লেখা কবিতা, ষাটের দশকের প্রেমিকাকে মনে করে লেখা কবিতা, মৃত্যুবিষয়ক নানা কবিতা পাই। কবিতাগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করলেই বোঝা যায় এই পর্বে কবির পরিণত চিন্তন এবং কবি মনের প্রশান্তি। ১৯৮৩এর ডায়েরিতে বারবার লিখেছিলেন কবি — "অনেক শান্ত হতে হবে।"

'নীল রঙের গ্রহ' আসলে স্বপ্নীল এই পৃথিবী; পৃথিবীর কথা-জগতের কথা। এই কাব্য বিশ্লেষণ করে আমরা পেয়েছি, কবির আশে-পাশের মানুষের প্রতি নিখাদ ভালবাসা। ভালবাসেন কবি পৃথিবীর পরিবেশ। কবি এই কাব্যে বিশ্বচিন্তার প্রাগ্রসরতা দেখিয়েছেন। প্রকৃতির কথা এই কাব্যে অনুধাবন করতে হলে প্রচ্ছদ পর্যবেক্ষণ থেকেই তার সূচনা করতে হবে। কবির নিজের অসুখ বারবার এই কাব্যে তাঁকে চিন্তায় ফেলেছে: কন্যার ভবিষ্যৎ বিষয়ে। আলাপ অংশে ব্যক্ত হয়েছে কবির আকাঙ্খা —

সাদা হাড়ের ভেতর থেকে উঠে আমি আবার গান গাই:
হে পুরোনো হারমোনিয়াম তুমি ফিরে এসো আমার কাছে

এক আনন্দ এই কাব্যের ছত্রে ছত্রে আছে। কবি জানেন আনন্দ জগতের মধ্যে থেকেই লাভ করতে হয়। তাই বারবার নীল রঙের বৃহৎ জগতের কথা বলা। এই কবির কবিতা নিবিড়ভাবে পাঠ করলেই বোঝা যায় কাব্যগ্রন্থর প্রথম থেকে শেষ কবিতায় একই সুর বাজেনি। বহু মিশেল ভাবের সমাহার এই কাব্যগুলি।

'কীরকম আছো মানুষেরা' এবং 'জিরাফের ভাষা' কাব্যদুটি রচিত হয়েছিল একই সময়ে পাশাপাশি। প্রকাশিতও হয় একই বছরে। 'কী রকম আছো মানুষেরা' কাব্যে আমরা দেখতে পাই কবির অসুস্থতা বৃদ্ধিজনিত কারণে তিনি আরো বেশি করে মানুষের কাছাকাছি আসতে চাইছেন, মানুষের পাশে থাকতে চাইছেন। 'জিরাফের ভাষা' আদতে কবির গলা উঁচু করে বলা কিছু অনন্য কথা ও কবিতা বলেই আমাদের মনে হয়। অলঙ্কারহীন, ভণিতাহীন, পাঁচ লাইনের আটচল্লিশটি সংখ্যাচিহ্নিত কবিতা। কবি হয়ত বুঝতে পারছিলেন দুরারোগ্য ক্যান্সার এবার তাঁকে মানুষের থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে। তাই যাওয়ার আগে কিছু কথা কবি আমাদের ধীর স্বরে শুনিয়ে যেতে চেয়েছেন। কবি এই কাব্য উৎসর্গ করেছিলেন — মা, বাবাকে। কবির যন্ত্রণা আমরা বুঝতে পারি ৩ নং কবিতার প্রথম দু'লাইনে —

ওরা দেখতে চায় আমি ছটফট করতে করতে মরে যাচ্ছি।
মরছি শুধু মরে যাচ্ছি।

আবার এই কাব্যগ্রন্থেরই ৪৮ নং কবিতায় পাচ্ছি কবির শেষ ইচ্ছা —

চলে যেতে হয় বলে চলে যাচ্ছি, নাহলে তো আরেকটু থাকতাম।

অধ্যাপক মানবেন্দ্রনাথ সাহা 'কবি ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতা' প্রবন্ধে আমাদের জানিয়েছেন, ''ভাস্করের কবিতার মধ্যে জীবনের অনাবিল সুখ ও অসুখ দুইই আছে,আছে ভণিতাহীন যাপিত জীবনের সমস্ত অনুভূতি। কবির সুখ, অসুখ, ব্যর্থতা, গ্লানি, যন্ত্রণা, দহন সবকিছু চনমনে জীবনের ভঙ্গিতে অথচ অননুকরণীয় ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে।'' আমাদেরও তাই মনে হয় কীভাবে বাঁচব এই প্রশ্নের উত্তর কবি আজীবন সন্ধান করে ব্যক্ত করেছেন তাঁর কবিতায়। জীবনের প্রসঙ্গ আসলেই বারবার ফিরে ফিরে পড়তে হয় ওঁর কবিতা।

৩

ভাস্কর চক্রবর্তী ১৯৯৩ সালের মে/জুন মাসে সাহিত্য অকাদেমির আহ্বানে ব্যাঙ্গালোরে যান আধুনিক কন্নড় কবিতা অনুবাদের কাজ নিয়ে। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন মূল উদ্যোক্তা। ভাস্কর চক্রবর্তী মোট ন'জন কবির এগারোটি কন্নড় কবিতা মূল ভাষা থেকে অনুবাদ করেছিলেন। কবি বিদ্রোহ-প্রকাশক কবিতাগুলিকেই চয়ন করেন। কে.ভি. থিরুমালেশের 'নিকারাগুয়া: অপরাধবোধ' কবিতার প্রথম দু'লাইনের অনুবাদ —

ত্রিবান্দ্রম ৬৬, আমরা হাঁটছিলাম

আর, সানদিনিস্তা আন্দোলনের কথা বলছিলাম।

চে গুয়েভারার নেতৃত্বে ১৯৬৬ সালের রক্তক্ষয়ী নিকারাগুয়ার বিপ্লবের কথাই বলা হয়েছে এখানে।

গ্যেটের বন্ধু হার্ডার মনে করতেন, অনুবাদের মাধ্যমেই বিশ্বসংস্কৃতির স্বাদ আমরা লাভ করতে পারি। তবে সেই আস্বাদ আমরা তখনই পূর্ণরূপে লাভ করতে পারব যখন অনুবাদ যথাযথ ও মূলানুগ হবে। ভাস্কর চক্রবর্তী এটা জানতেন তাই কবিতা অনুবাদের দুই পন্থাই গ্রহণ করেছিলেন। করেছিলেন কবিতার আক্ষরিক অনুবাদ আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভাবানুবাদ।

৪

অনুকম্পার্হ ব্যক্তির উপর অনুকম্পাকারীর সম্ভ্রমশূন্য রতিভাবকেই বলে বৎসল। যথোচিত বিভাবাদির মিলনে বৎসলরতি বাৎসল্যরসে পরিণত হয়। বাৎসল্যরতিতে মমতার আধিক্য থাকে। এর উদ্দীপন বিভাব হলো — বাল্যচাপল্য, বাল্যক্রীড়া প্রভৃতি। অনুভাব — লালন, প্রতিপালন, উপদেশদান প্রভৃতি। আমরা বৈষ্ণবসাহিত্যে শাক্তসাহিত্যে উৎকৃষ্ট বাৎসল্যরসের পদ পেয়েছি। তবে সেটা মধ্যযুগে। আধুনিক যুগের কবিদের মধ্যেও বাৎসল্য রসের প্রয়োগ দেখা যায় তবে সেটা অনেকটাই আত্মমুখী ও নিজ সন্তান-সমীক্ষার পর্যায়ে।

ভাস্কর চক্রবর্তীর উক্ত কবিতাটি প্রকাশিত হয় ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে কৃত্তিবাস পত্রিকায়। কবি আনুষ্ঠানিক বিবাহ করেন ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর কবি গোবিন্দ চক্রবর্তীর কন্যা বাসবী চক্রবর্তীর সঙ্গে। কবির একমাত্র কন্যা প্রৈতি চক্রবর্তী — কবির সোনাঝুরি। স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে কবির বাৎসল্য রসের প্রকাশ হবে তাঁর কন্যাকে কেন্দ্র করেই। কবি জানতেন তিনিও একদিন পিতা হবেন; সন্তানের দায়িত্ব তাঁকেও গ্রহণ করতে হবে। মরুপ্রদীপ-১ কবিতাতে সেই কথার প্রাথমিকরূপ ব্যক্ত হয়েছে। এরপরের কবিতাগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে তার বিকশিতরূপ। ততদিনে ভূমিষ্ঠ হয়েছেন কবিকন্যা।

ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতায় বাৎসল্য রসের ব্যবহারিক প্রয়োগ শুরু হয়েছে বহুপূর্বেই 'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা' (১৯৭১) কাব্যগ্রন্থে। এই কাব্যগ্রন্থের 'ছোটো বোন' কবিতায় অনেক আগেই আমরা পেয়েছি কবির স্নেহ ও ভালবাসার এক মধুর দরদী প্রস্রবণ। কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করছি — 'আমি কি পাহারা দেব / ছোটো বোন ঘুমায় যখন / দুপুরে, আকাশ নীল / শরীরের, শান্ত কলরব / আমি কি ঘুমোব পাশে / ছোটো বোন ঘুমায় যখন'। এই কবিতাটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতায় বারবার ফিরে এসেছে এই ছোট বোন প্রসঙ্গ। ভাস্কর চক্রবর্তী ছিলেন বাবা-মায়ের অষ্টম সন্তান। তাঁর সাত বোন ছিলেন ও দুই ভাই। 'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা' পরবর্তী বিভিন্ন কাব্যে বোনেদের কথা, মায়ের কথা, বাবার কথা বর্তমান। ভাস্কর চক্রবর্তী 'রাস্তায় আবার' (১৯৮৩) কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করেছিলেন সেজদি শিবানী চক্রবর্তীকে। উৎসর্গপত্রে লেখা ছিল — 'হাত দুখানা ক্ষমাসফল' এই প্রশংসাবাক্য। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে সেজদির ক্ষমাসফল চরিত্র পারিবারিক পরিবেশে প্রভাব ফেলেছিল ওঁর ওপর। চারাগাছ প্রচুর জলহাওয়া সহ্য করে; মাটি থেকে রস গ্রহণ করেই মহীরূহে পরিণত হয়। দয়া, মায়া, মমতার প্রথম পাঠ প্রত্যেকেই পরিবারে গ্রহণ করে বড় হয়ে ওঠে। এই দয়া-মায়া-মমতাই ক্রমশ স্নেহ ও প্রেমে পরিণত হয়। এই কাব্যগ্রন্থের 'ডাল' কবিতাটি উদ্ধৃতিযোগ্য — 'যখন সেদ্ধ হতে চায় না ডাল / সারা বাড়ি / থমথম করে। স্নান করে / বাবা দাঁড়িয়ে থাকেন। স্নান করে / দিদি দাঁড়িয়ে থাকেন। / আর সকালবেলা, আমি চমকে উঠি — / সমস্ত বাড়ি চুপচাপ / মা বসে আছেন উনুনের পাশে।'

এ হলো সঙ্গাবদ্ধ জীবন মানুষের প্রেরণা। এজন্যই আমরা কবিতার কাছে বারবার ফিরে আসি। 'শয়নযান' (১৯৯৮) গ্রন্থে পরিবারের এই বিষয়গুলি স্পষ্টভাবে বলা আছে। আমরা জানি শিশুর পিতা শিশুর অন্তরেই ঘুমিয়ে থাকেন। ভাস্কর চক্রবর্তী যখন নিজে পিতার আসনে উন্নীত হন তখন তাঁর কন্যাকে নিয়ে লেখা কবিতাগুলিই কবির বাৎসল্যচেতনার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের কাছে। কবি নিজে যখন সন্তান ছিলেন তখন বাৎসল্য গ্রহণ করেছেন পিতা ব্রহ্মময় চক্রবর্তীর কাছে। আর সেই বাৎসল্যই ধীরে ধীরে প্রফুল্লকানন হয়েছে যখন তিনি নিজে পিতা হয়েছেন সোনাঝুরির।

পোলিশ কবি Tadeusz Rudzewiczএর কবিতা ভাস্কর চক্রবর্তী ১৯৮৮ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত অনবরত অনুবাদ করে গেছেন। সেসব কবিতার কিছু কিছু পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়। চেয়েছিলেন রুজেভিচের অনুবাদ কবিতাগুলিকে নিয়ে একটা বই করতে। কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। কবিতাগুলি অগ্রন্থিত থেকে গেছে।

ভাস্কর চক্রবর্তী রুজেভিচের কবিতার Primary Source হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন ইংরাজিতে অনূদিত Penguin Modern European Poets সিরিজের Tadeusz Rudzewicz: Selected Poems (1976, Translated by Adam Czerniawski) বইটি এবং Magnus J. Krensky & Robert A. Maguire অনূদিত Princeton University, New Jersey প্রকাশিত The Survivor and other Poems (1975) বইটি।

রুজেভিচের In the midst of Life কবিতাটি ভাস্কর চক্রবর্তী অনুবাদে নাম দিয়েছিলেন — জীবনের মাঝখানে। এই কবিতায় একজন সন্তান ও তার পিতার কথা বর্তমান। কবিতায় কবি বলতে চেয়েছেন একজন সন্তানকে তার পিতা ক্রমশ ঠেলে দিচ্ছেন সমাজের রূঢ় বাস্তবতার দিকে — সন্তানের জীবনবোধের ধারণা যাতে গড়ে ওঠে সেই উদ্দেশ্যে। সন্তানের জন্য এক সুস্থ পৃথিবী রেখে যেতে চান প্রত্যেক পিতা-মাতাই। এরপরের নানা অনূদিত কবিতার মধ্যে এই সন্তানের কথা, পিতার কথা, সন্তানের প্রতি পিতার বাৎসল্য নানাভাবে ফুটে উঠেছে। 'পাঠক চাইলে একটা স্বর', 'অন্য রূপ', 'আমাদের একা থাকতে দাও', 'বোঝা সরিয়ে নাও', 'উত্তরজীবী' ইত্যাদি অনূদিত কবিতাগুলি ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতা সমগ্রর দ্বিতীয় খণ্ডে আছে।

সেইসব কবিতায় আমরা সন্তানদের জন্য কী পৃথিবী রেখে যাচ্ছি! সন্তানের জন্য রেখে যাওয়া পৃথিবীর সমস্যা — এখনকার সমস্যা প্রভৃতি বিষয়গুলি নিখুঁতভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। সমাজ সমস্যা, কবির সময়কে ওইসব কবিতায় অভ্রান্তভাবে ব্যক্ত করেছেন কবি। ভাস্কর চক্রবর্তী অনুবাদের জন্য চয়ন করেছিলেন রুজেভিচের এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কবিতাগুলিকেই।

'তুমি আমার ঘুম' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে। এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি লিখিত হয় ১৯৯২-৯৭ সময়ের মধ্যে। ওঁর কবিতায় মৃত্যুচিন্তা ও অস্তিত্বহীনতার কথা আমরা প্রায়শই লক্ষ্য করে থাকি। কবি যখন থাকবেন না তখন কন্যার কী হবে; একজন পিতার সহজ-সরল আকুতি ব্যক্ত হয়েছে 'সোনাঝুরি' কবিতায় —

কে তোকে বেড়াতে নিয়ে যাবে রোজ বিকেলবেলায়?
আমি তো যাবো না আর।
আমি যে কোথায় থাকবো বড় হয়ে জানতে পারবি।

কবির চিন্তা হয় সন্তানের জন্য যে পৃথিবী তিনি রেখে যাচ্ছেন সেই পৃথিবীতে সন্তান ভাল থাকবে তো!

পৃথিবীটা এখনও তেমন নয় মোটে। চিন্তা হয়।
কথাই শিখিসনি আজও ঠিকঠাক।
চিমটি খেতে খেতে একদিন
হয়তো বা বিগড়ে যাবি। নষ্ট হয়ে যাবি।

কবি জানেন তিনি যখন থাকবেন না মেয়ে তখন তাঁকে খুঁজবে—

শুধুমাত্র তোরই জন্য থেকে যেতে ইচ্ছে হয়েছিলো।
ভয় পেলি নাকি খুব? দূর বোকা!
আমি তোর সঙ্গে সঙ্গে এই তো চলেছি।

এ প্রত্যয় প্রত্যেক পিতারই।

'বাবাকে সোনাঝুরির চিঠি' প্রৈতি চক্রবর্তীর এই লেখাটি প্রকাশিত হয় যাপনচিত্র বইমেলা ২০১৯ সংখ্যায়। সেখানে কবিকন্যা স্পষ্টভাবেই লিখেছেন — "তুমি জানো না ভিড়ের মধ্যে হাত ছেড়ে দিলে কতটা ভয় লাগে আমার। এভাবে চলে যায় কেউ? মাঝে মাঝে এসে দেখা করে কোথায় যে চলে যাও? খুঁজে পাইনা আর।" সোনাঝুরি কবিতাটি লেখা হয়েছিল ২১-১১-১৯৯৬এ। প্রকাশিত হয়েছিল দেশ পত্রিকায়। কবি সত্যিই সত্যদ্রষ্টা। কন্যার চিঠিই কবির আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত করেছে।

এই কাব্যগ্রন্থেরই 'মৃত্যু' কবিতার শেষ দুই স্তবকে পাই —

মেয়েকে কাছে ডাকবো একটু ?
আরো দু-একটা দিন বাঁচতে পারলে
মন্দ হতো না।

কবির অসুখের সুখ সন্তানের মুখ। এটা স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে। 'কীরকম আছো মানুষেরা' (২০০৫) কাব্যগ্রন্থেও আমরা 'সোনাঝুরির জন্যে আরো একটা' নামে কবিতা পাচ্ছি। যে কবিতায় কবির সংসারের ছবি ফুটে উঠেছে। কবিতাটি এরকম —

আমি দূর থেকে দেখছিলাম
ছেঁড়া একটা জামা পরে মেয়েটি বাজার করছে।

মা হয়তো পাঠিয়েছে বাজারে। টাকাপয়সা কম।
মনে হলো,মুঠো শক্ত করে ধরলো একবার বাজারের থলিটা।
ঘাম মুছলো।

নিচের ঠোঁটটা একবার কামড়ে ধরলো কি দাঁত দিয়ে?
— আমাদের সোনাঝুরি না? আরে,কত বড়ো হয়ে গেছে!

কেমন আছো সোনাঝুরি? কেমন আছো?

কবি যখন থাকবেন না তখন মেয়েই সংসারের কাজ করবে, বাজার করবে। প্রত্যেক পিতাই চান তাঁর উত্তরাধিকার বহন করুক সন্তান। মনে পড়ে যাচ্ছে বীরভূমের খ্যাতনামা গল্পকার মুক্তি মুখোপাধ্যায়ের 'উত্তরপুরুষ' গল্পটির কথা। মনে পড়ছে Alpha সিনেমার কথা।

এই কাব্যগ্রন্থেরই অপর একটি কবিতা হলো 'কে জি ।।'। কবিতার শুরুতেই আছে পিতার সন্তানকে এক সরল প্রশ্ন — কন্যা বাংলা যুক্তাক্ষরগুলো ঠিকঠাক চিনেছে কিনা। পিতার দ্বিতীয় প্রশ্ন কন্যার কাছে — ন'টা গ্রহের নাম। এরকমই কিছু সহজ আপাত সরল প্রশ্নে মুখর কবিতাটি। অনেক সমালোচক হয়তো এই কবিতাটি কতটা কবিতা হয়ে উঠেছে এই প্রশ্ন তুলবেন। কিন্তু আমার মনে হয় এই প্রশ্ন নিরর্থক। এটি একটি সার্থক বাৎসল্যচেতনার কবিতা। এই কবিতাটি রচিত হয়েছিল অথবা বলা যেতে পারে পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছিল ২১/১০/১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে। প্রকাশিত হয়েছিল কৃত্তিবাস পত্রিকায়। আমি মনে করি কবিতাটি স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে স্থান পাওয়ার অধিকারী। কবির এ কবিতায় মাতৃভাষাচিন্তন ও বাঙালিচেতনা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। আপাত কিছু প্রসঙ্গের অবতারণা করে করে শেষে দেওয়া হয়েছে চরম মার। সমাজ সম্পর্কে, চারিপাশের নানা ব্যভিচার সম্পর্কে কবি সচেতন। কবি জানেন বেকারত্বের ক্ষুধা-যন্ত্রণা। সেই কথাই প্রবল ভাবে এখানে ব্যক্ত হয়েছে—

মা, যুক্তাক্ষরগুলো ঠিকঠাক চিনেছো তো?
জানো তো ঠিকঠাক নটা গ্রহের নাম?
রবিঠাকুরের একটা কবিতা আবৃত্তি করো তো?
'আনন্দ' এই শব্দটা দিয়ে একটা বাক্য লেখো।
সাজিয়ে লেখো শব্দটা: তালকাক
শূন্যস্থান শিখেছ? পূরণ করো: বা_লা_যা।
যোগ করো বিয়োগ করো গুণ করো ভাগ করো
মাটির নিচের পাঁচটি সবজির নাম বলো তো?
দশটা ফুল? দশটা ফল?
এভাবেই তোমাকে ঝটপট শিখতে হবে আরো অনেক কিছু।
আর হাজারো পাঠক্রম তোমাকে গিলতে হবে তারপর —
তারপর, পচতে হবে।

শিশুর প্রথম অক্ষরজ্ঞানের পাঠ শুরু হয় পিতা-মাতার কাছেই। ঘর থেকেই চেনা শুরু হয় জগৎ। পাঠের পর দিতে হয় নানা প্রশ্নের উত্তর। এখানেও কবিকন্যার কাছে কবি জানতে চাইছেন উত্তর সে এগুলো জেনেছে কিনা। পাঠক্রমের চাপ, নিষ্ক্রিয়তার প্রতি কবি উগরে দিয়েছেন ক্ষোভ। শেষে কন্যাকে মায়ের কাছে রেখে চলে যেতে হয় কবিকে তেইশে জুলাই ২০০৫। 'জিরাফের ভাষা' (২০০৫) কাব্যগ্রন্থের ৪৮ সংখ্যক কবিতার শেষ লাইনে ছিল — 'চলে যেতে হয় বলে চলে যাচ্ছি,নাহলে তো আরেকটু থাকতাম।'

শেষ করি কবিকন্যার কথায় — "একদিন তোমার ঠিকানা খুঁজতে খুঁজতে ঠিক তোমার কাছে পৌঁছে যাবো, সেদিন আমি আমার সব ইচ্ছাগুলোকে একটা একটা করে পূরণ করব। মনে থাকে যেন! ততদিন নিজের যত্ন নিও। রাত জেগো না বেশী। ওষুধগুলো খেও মনে করে আর অবশ্যই লিখো, কেমন?" (যাপনচিত্র, বইমেলা ২০১৯)। এই কথাগুলিও তো আবার প্রতিবাৎসল্যের পরিচায়ক। পৃথিবীর সমস্ত সম্পর্কগুলির মধ্যে সব থেকে মধুরতম সম্পর্ক পিতা-পুত্রীর সম্পর্ক।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। অভীক মজুমদার, 'বাস্তবতার মায়া', ঋক প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০২২।

২। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, 'সাহিত্য ও সমালোচনার রূপ-রীতি', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৬।

৩। জয় গোস্বামী, 'ভাস্কর চক্রবর্তী স্মরণে', সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুআরি ২০১৫।

৪। তরুণ মুখোপাধ্যায়, 'কবি ভাস্কর চক্রবর্তী: নিঃসঙ্গ সিসিফাস', অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুআরি ২০০৭।

৫। প্রশান্ত মাজী, 'আমার মন ছুটেছে বর্ধমান', ঋক প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০১৭।

৬। প্রশান্ত মাজী, 'শুনো না তত্ত্বের কথা', ভালো বই, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০১৩।

৭। মনোজ চাকলাদার অনূদিত, 'আলব্যের কামু, দ্য মিথ অব সিসিফাস', এবং মুশায়েরা, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, মে ২০১০।

৮। সুবল সামন্ত সম্পাদিত, 'বাংলা কবিতা: সৃষ্টি ও স্রষ্টা', প্রথম খণ্ড, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ২০১৫।

৯। সুব্রত চক্রবর্তী, 'প্রিয় ভাস্কর', ভালো বই, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০১৪।

১০। সুমন্ত মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'ভাস্কর চক্রবর্তী কবিতাসমগ্র', প্রথম খণ্ড, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, জানুআরি ২০১৭।

১১। সুমন্ত মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'ভাস্কর চক্রবর্তী কবিতাসমগ্র', দ্বিতীয় খণ্ড, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, জুলাই ২০১৭।

১২। সুমন্ত মুখোপাধ্যায়, বাসবী চক্রবর্তী সম্পাদিত, 'ভাস্কর চক্রবর্তী গদ্যসমগ্র', প্রথম খণ্ড, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, জানুআরি ২০১৯।

লেখক পরিচিতি:

রাহুল ঘোষ: বিশ্বভারতী বাংলা বিভাগের জুনিয়র রিসার্চ ফেলো। গবেষণার বিষয় ''ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতা, ভাস্কর চক্রবর্তীর গদ্য: একটি সমীক্ষা''। পত্রিকা-সম্পাদক, প্রাবন্ধিক, কবি। অনুবাদ করেছেন অটলবিহারী বাজপেয়ীর নির্বাচিত কবিতা।